পঞ্চম অধ্যায়

ভাষাশৈলী

বস্তুত, ভাষাই কোন সাহিত্য - স্রষ্টার অন্যতম মৌলিক সত্তা । একজন সাহিত্যিক তাঁর কর্মে চিন্তায় ও মননে ভাষাকেই সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । কারণ ভাষা তার ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। তবে সাহিত্যের ভাষাগত বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ ভিন্ন চেতনায় সংস্থাপিত । এক্ষেত্রে লেখকের উপলব্ধি এবং পর্যবেক্ষণশক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় রূপ নেয় একটি নির্দিষ্ট ভাষাগত শৈলী । কার্যত একটি পরিবর্তিত চিন্তাশীলতার ক্ষেত্র ধরেই অগ্রসর হয় লেখকের এই উপলব্ধি এবং চিন্তাজগত । ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার ওয়ালীউল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । তবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষারীতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা এক ঝলক দেখে নেব বাংলা গদ্য চর্চার ইতিহাসকে ।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন আমরা পাই 'চর্যা' পদাবলীর গীতিকায় । কিন্তু এর সবটাই পদ্যে রচিত । বস্তুত বাঙালির লেখা সন - তারিখ যুক্ত যে সকল প্রাচীন গদ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে তার প্রায় সবকটিই হয় চিঠি না হয় দলিল - দস্তাবেজ । এর মধ্যে প্রাচীনতম চিঠিটি অহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে লেখা । লেখক কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ। সেকালের বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসেবে পত্রটি মূল্যবান এবং একারণেই উল্লেখযোগ্য --

''লেখনং কার্য্যঞ্চ । এথা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি । অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে । তোমার আমার কর্ত্তব্যে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক । আমর উদ্যোগত আছি । তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় । না কর তা আপনে জান । অধিক কি লিখিম ।''[১]

পত্রটির রচনাকাল সম্বন্ধীয় ধারণা প্রামাণিক বলে বিবেচিত হলে সন্দেহ থাকে না যে, ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যবহারিক বাংলা গদ্য অনেকটাই সুগঠিত হয়েছিল । এছাড়া মহারাজা নরনারায়ণের লেখা এই পত্রাংশ থেকে বোঝা যায় বাংলা গদ্য প্রথমাবধি সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দ-নির্ভর ছিল । সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল শাসনামলে রাজভাষা হিসেবে আরবি - ফারসি

ভাষা বাধ্যতামূলক করা হলে ধীরে ধীরে লেখ্য বাংলা গদ্যে আরবি - ফারসি ভাষার প্রবেশ ঘটতে থাকে । যদিও ভাষা হিসেবে আরবি বা ফারসি কখনোই 'দরবারি ভাষা'-র মর্যাদা অতিক্রম করে বাংলার লোকজীবনের ব্যাপক পটভূমিতে দূর প্রসারিত হতে পারেনি । কারণ জীবনের সহজ প্রয়োজনে আরবি-ফারসির বাচনভঙ্গি ও শব্দ ভান্ডারের আশ্রয় বাঙালি অল্পই গ্রহণ করেছিল । একারণে পরবর্তীকালে লিখিত বাংলা গদ্যে মুসলমানি প্রভাবের আধিক্য একমাত্র আদালতের ভাষাতেই লক্ষ্য করা যায় । আর তারই কারণে প্রায় একই সময়ে রচিত রাজা নন্দকুমার এবং জগতধির রায়ের ভাষা-ভঙ্গিতে পার্থক্য এমন মৌলিকরূপে ধরা দেয় । যথা--

রাজা নন্দকুমারের পত্র- (মহারাজ নন্দকুমার তার পুত্র গুরুদাসকে ১১৮৭ সালের ২৯-শে পৌষ এই পত্রটি লিখেছিলেন)

''প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্বাদশিবঞ্চ বিশেষ :-

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা করনক অত্র কুশল পরন্তু '২৫ তারিখের ২৭ রোজ' রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুক্ত কেতরত আলী খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ যে লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পহুঁছেন নাই পহুঁছিলেই জানা যাইবেক শ্রীযুক্ত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক ।''

{জগতধির রায়ের পত্র-(পত্রটির লিপিকাল ১১৮৫ সালের ১১-ই শ্রাবণ)}

''৭ শ্রীরাম

গরিব নেওয়াজ শেলামত -

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়া শীকিশ্তি হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শতী চাক্‌লে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমদেওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুছিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারকে হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ ।

ফিদবি-

জগতধির রায় ।''[২]

ইসলামি শাসনের পতন হলে পরবর্তীতে বাংলা গদ্যের সংস্কৃত ভাষা-নির্ভরতার পুরাতন প্রবণতা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ প্রবর্তিত বাংলা গদ্যের সংগঠনে । যদিও ইংরেজরাও বাংলা গদ্যের প্রথম বিদেশি শাসক নন । এ পথে সর্বপ্রথম এসেছিলেন পর্তূগীজ ধর্মযাজকেরা ।

পর্তূগীজ ধর্মযাজকদের বাংলা গদ্যের নির্মাণে সেরূপ কোন উৎসাহ ছিল না । মূলত দেশীয় ভাষায় ধর্মপ্রচারই ছিল তাঁদের লক্ষ্য । তবুও তাঁদের বাংলা গদ্য চর্চার একটা সুফল তো ছিলই । এঁরা ব্যাবহারিক প্রয়োজনের গন্ডী ছাড়িয়ে বাংলা গদ্যকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। বিষয়ে না হোক্ , প্রসঙ্গে অন্তত গভীরতা সঞ্চারের এ উদ্যম লিখিত গদ্য ভাষা রচনার একটা নতুন মাত্রা খুঁজে পেয়েছিল । লেখ্য গদ্য রচনার এক অবচেতন , অস্ফুট প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এখান থেকেই ।

পর্তূগীজ ক্ষেত্রে যেমন শুধুমাত্র ধর্মযাজকদের মধ্যেই বাংলা ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়েছিল তেমনি, ইংরেজদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় সিবিলিয়ান বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা । বৃটিশ-ভারতের সিভিল-সার্ভেন্টদের দেশীয় ভাষা শেখাবার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ । মূলত এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শিল্পিত শব্দবিন্যাস ঘটে । পরবর্তীতে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) বাংলা গদ্যচর্চায় মুক্তভাবনা এবং শিল্পদর্শনগত চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন । নবীন বাঙালি জীবনের নবসংস্কৃত রূপের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে রামমোহন আমাদের ভাষাকে অভিনব প্রেরণার দোলা দিয়েছিলেন । তা না হলে সমসাময়িককালে বাংলা গদ্যের রূপগত যে সাধারণ বিকাশ ঘটেছিল , রামমোহনের রচনায় সেই ভাষাশৈলীর দূরত্ব এবং পার্থক্য লক্ষিত হত না । বস্তুত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন নিজের সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের তীব্র প্রতিষ্ঠার প্রবলতাবশত বাংলা গদ্যের একটি স্বতন্ত্র ‘স্টাইল’ তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন । যদিও রীতির দিক থেকে সে ভাষা অন্বয় জটিল , শব্দচয়নেও তার প্রাঞ্জলতা সর্বত্র সমান নয় তবুও রামমোহনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে তাঁর বলিষ্ট ব্যক্তিত্বের একাগ্রতা যুক্ত হয়ে তাঁর ভাষাকে এক দুর্লভ স্বকীয়তা দিয়েছিল, যুগের পক্ষে যা ছিল দুর্লভ ।

শ্রদ্ধেয় রমেশ চন্দ্র দত্ত রামমোহনের লেখ্য গদ্য ভাষার স্বভাব বিশ্লেষণে বলেছিলেন--

"Bengali prose had not yet received the purity and grace which subsequent writers have imported to it, But Ram Mohan's rugged and well-reasoned style suited the great tassk he set before himself,- to battle single-handed against a host of unreasoning antagonists , and to expose evil customs and hurtful practice"[8]

বস্তুত রাজা রামমোহান রায় ছিলেন বাংলা ভাষার এক স্বয়ংস্বতন্ত্র লেখক । অতঃপর আলোচ্যযুগের বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় নামটি হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের । মূলত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা গদ্যে সৃষ্টিশীল শব্দবিন্যাসে সৃষ্টি শক্তির পূর্ণ জাগরণ ঘটান। তাঁর প্রথম 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-তেই (১৮৪৭ খ্রী:) 'প্রবেশিয়া' 'জিজ্ঞাসিয়া' ইত্যাদি নামধাতু প্রয়োগের সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । বিদ্যাসাগর এধরনের ব্যবহারের উদ্ভাবক নন , কিন্তু পূর্বসুরিদের তুলনায় তাঁর প্রয়োগ অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাবলীল । কেবল শব্দপ্রয়োগের সাফল্যেই নয়, বিরাম, যতি চিহ্ন ব্যবহারের কুশলতা সূত্রেও বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের গঠনে এক নূতন পরিণতির সূচনা করেন । বিদ্যাসাগরের রচনায় ভাব, ভাষা, বিষয়, বাচ্য এবং বাক্য এক অনির্বচনীয় রসব্যঞ্জনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল । একারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল ভাষার কারুকুশলীই নন, বৃহত্তর বাঙালি জীবনধর্মের রসরূপকারও বটে । বাংলা গদ্যে তাঁর দানের পরিমাপ ও মূল্যায়নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি হয়ত কখনো কখনো ঘটেছে; কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্বরূপ আবিষ্কারে কোন সংশয় বা বিতর্কের অবকাশ কখনোই লক্ষিত হয়নি । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তিনি বাংলা গদ্যের 'প্রথম যথার্থ শিল্পী' । তার পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তিনিই বাংলা গদ্যে প্রথম কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন এবং সংস্কৃত শব্দাবলীর অকারণ আমদানি কাটিয়ে বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করেন ।

এদিক থেকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিদ্যাসাগরের-ই পথের অনুসারী । তৎসম শব্দের ব্যবহার, সমাসের আড়ম্বর, বিশেষণ পদে স্ত্রী প্রত্যয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী বাক্য গঠন ইত্যাদি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-র (১৮৬৫) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । যেমন--

''পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দির মধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্তি স্থাপিত আছে । সেই মূর্তির পশ্চাদ্ভাগে দুইজন মাত্র কামিনী । যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র

সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন । পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমন্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্য্য পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণপারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিললেন যে, এই নবীনা হীনবংশসম্ভুতা নহে ।.....

তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয় মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে । উভয়েই পশ্চিমদেশীয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী । যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন । তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মিসমূহ প্রপতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত । কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুনে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে ।'[৫]

তবে 'কপালকুন্ডলা'-য় এসে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য পরিণতি পেয়েছে একান্ত নিজস্বতায়। ক্রমশ হয়ে উঠেছে কাব্যমাধুর্যমন্ডিত। বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্যের সৃজনশীলতার যে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিক নির্দেশিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভা, ঐতিহ্য এবং নিজস্বতার গুণে সেখানে এনে দিয়েছিলেন শিল্পিত এবং সাহিত্যিক ভাবমাধুর্য ।

বঙ্কিম উত্তরসূরিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস (১৮৭৭-৭৮ সালে লিখিত উপন্যাস 'করুণা' বাদে) 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) এবং 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) -তে বঙ্কিমী রীতি অনুসরণ করলেও অচিরেই তা পরিত্যাগ করেন । তাঁর মত প্রাজ্ঞব্যক্তি এটা সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে এই গদ্য রীতি তাঁর নিজের নয়। তিনি তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'চোখের বালি (১৯০৩)'-তে বাংলা গদ্যকে নবরূপে আবিষ্কার করেন । তাঁর এই 'চোখের বালি'-র আসল স্বাতন্ত্রই রীতিতে, বিষয়বস্তুতে নয়। রবীন্দ্রনাথের লেখনী বর্ণনায়, বিশ্লেষণে ও বাক্- চাতুর্যে এখানে সাধুভাষা পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে । এই সময়ে লেখা গল্প-উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ভাব-ভাষার টানাপোড়নের যেন নব নব ইন্দ্রজাল বুনেছেন, গদ্যের মধ্যেও কাব্যের সুষমা সঞ্চারিত করেছেন --

''বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে এক দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহা স্নিগ্ধ করিয়া দিল ।বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর একটি

মানুষ দেখিতে পাইল । এই দীপ্তিমন্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখানো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস -কৌতুক বিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই ।''[৬]

রবীন্দ্রনাথের এ গদ্য অনবদ্য, ঐশ্বর্যমন্ডিত, মহীয়ান এবং মধুর । 'চোখের বালি'-তে তিনি চরিত্র সমূহের আতেঁর কথা টেনে বার করে আনতে চেয়েছেন । এখানে আখ্যানভাগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, দীর্ঘায়িত চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের ধারা । চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার বিচিত্র কর্মের ও চিন্তার কার্যকারণ সম্বন্ধটিকে আবিষ্কার করার এ জাতীয় প্রয়াস এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এই উপন্যাসেই প্রথম দেখা গেল । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' উপন্যাসে কিছুটা লক্ষণ ফুটে উঠলেও বাংলা উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহরীতি-র সঠিক সূচনা 'চোখের বালি' উপন্যাসের মধ্যে দিয়েই ঘটে ।

চেতনাপ্রবাহরীতি-র ব্যবহার ছাড়াও বাংলা গদ্যে কথ্যভঙ্গির সার্থক সাহিত্যিকরূপও প্রথম নির্মিত হয় রবীন্দ্রনাথের হাতে । তাঁর 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) এবং 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এ প্রসঙ্গে দুটি নিরীক্ষণীয় উদাহরণ । 'চতুরঙ্গ' কথ্যভঙ্গিম গদ্যের ঝোঁকে রচিত তবে মূল ভাষা সাধুগদ্যের আবরণে মোড়া । এর শব্দব্যবহারেও একই সঙ্গে রয়েছে গাম্ভীর্য আবার অভিজাত চলতি রীতির স্বচ্ছল আবেদন । অপর দিকে 'ঘরে বাইরে'-র ভাষা পুরোপুরি চলতি রীতির অনুসারী । এ উপন্যাসে চলিত ভাষাতেই কাব্যিক বা জীবনদর্শনগত নানা উপলব্ধি কিংবা হৃদয়ের নানা অনুভূতির প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ । তাঁর এই চলিত ভাষা প্রচলিত শব্দ, দেশি শব্দ, আগন্তুক শব্দ বা প্রবাদ সহযোগে একেবারে কথ্যস্তরে নেমে এসেছে । কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে--

ক. ''সেই দিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজিস্ট্রী করে আমি দখল করে বসলুম । তারপর থকে ঝুটোপুটি চলল''

খ. ''আমি বললুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ''

গ. ''হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবন সত্বের দাবী তার পুটুলি, তার প্যাটরা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত''

ঘ. ''তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নয় । যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে-সে নেহাত কাঁচা, অতি নরম ।''

ঙ. ''সেদিন বাংলাদেশের সময়ের কলে পুরো স্টীম দেওয়া হয়েছিল ।''[৭]

আমরা লক্ষ্য করব পুটুলি, প্যাটরা, ঝুলি, ভাইজি, ঝুটোপুটি, পুরোপুরি, বড়াই, উড়ুনি, ফুটো, ফাঁক ইত্যাদি দেশি ও কথ্য শব্দের পাশাপাশি রেজিস্ট্রি, আইডিয়া, গ্যাস স্টীম ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ, আবার তারই পাশে বিধবা, তীব্র, সংগ্রহ ইত্যাদি বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ, জীবনসত্ব, প্রাপ্তবয়স্ক প্রভৃতি সমাসবদ্ধপদ, লোকসান, নেহাত, সবুর, জরুর, আখের, ছুরি-র মত আরবী-ফারসী শব্দও সুষমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । উপন্যাসটির পটভূমি পূর্ববঙ্গ হলেও উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদের অতীতকালে 'লুম' প্রত্যয়ের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে কলকাতার উপভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । তাঁর আর কোন উপন্যাসে আগুন্তুক শব্দের এত ব্যাপক ব্যবহার চোখে পড়ে না। ইংরেজি শব্দের ব্যবহারও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে যেমন সহজে চোখে পরে সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে তেমন চোখে পরবে না ।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষা পরীক্ষার আর এক সফলতম এবং আশ্চর্য ফসল 'শেষের কবিতা' । 'শেষের কবিতা'-র ভাষাশৈলীর চমৎকারিত্বে মুগ্ধ পাঠক, সমালোচক শুধু সমকালে কেন একালেও পাওয়া দুষ্কর । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিচিত্র এবং বহুমুখী ভাষার সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন সমালোচক তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস' গ্রন্থে--

'' 'ঘরে বাইরে'-তে যে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল তার উদ্‌যাপন হল 'শেষের কবিতায়'; এর পর থেকেই চলতি ভাষার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠলো সাহিত্যে, আর সাধুভাষা পিছু হঠতে হঠতে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিলো রক্ষণশীলতার শেষ দুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে । রচনার মধ্যে ক্রিয়াপদের সংখ্যাহ্রাস, কথ্যভাষার ভান্ডার থেকে নতুন ক্রিয়াপদ ও অন্যান্য শব্দ সংগ্রহ, বাক্যবিন্যাসে মাঝে মাঝে ব্যুৎক্রম ঘটিয়ে ভাষার ছন্দে বৈচিত্রসাধন-এই সব নিয়ম, যা বাদ দিলে আজকের দিনে এক দন্ড চলে না আমাদের, এগুলো 'ঘরে বাইরে'-তে প্রবর্তিত হলেও প্রতিষ্ঠিত হল শেষের কবিতায় ।''[৮]

এভাবেই দ্যুতিময় সংস্কৃত, মৌখিক, প্রাদেশিক এবং নব উদ্ভাবিত শব্দমালায় বর্ণময় এবং অর্থময় ভাব ঐশ্বর্যে বিচিত্রতর যে স্বাদ 'শেষের কবিতা'-র ভাষায় তারই রেশ ধরে এগিয়ে যায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের ভাষা ।

তিরিশোত্তর কথাসাহিত্যে প্রধানত উঠে এসেছে সমাজ পরিত্যক্ত মানুষের জীবনালেখ্য, আর তাই তাদের ভাষাও হয়েছে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের মুখের ভাষা। একদিকে

যুবনাশ্বের (মণীশ ঘটক) 'পটলডাঙার পাঁচালী', অন্যদিকে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' আমাদের সেই জগতের সঙ্গে পরিচয় করে দেয় । মণীশ ঘটক তাঁর গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন চোর, ভিখিরি, পকেটমার, পতিতাদের ভাষা আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন কুলি, মুটে, মজুর ,কেরাণী, বেকার, জেলে,মুদি সাঁওতাল, বাউড়ি,হাড়ি, ডোম প্রমুখদের মুখের ভাষা । তবে সাহিত্যের একটি দিক তাঁদের শৈল্পিক যুগসাধনায় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে - সেটি তাঁদের 'জীবনের পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধির অভাব।' এঁদের রচনায় অনেকটা ফটোগ্রাফিক ছাঁচ আছে ।বহু ক্ষেত্রেই জীবনের জটিল ও গভীর বাস্তবতার সঠিক রূপায়ণ ঘটেনি । এদিক থেকে শ্রেষ্ঠ জীবনবাদী শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭১) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। এঁরা দুজন তিরিশের যুগের শিল্পী হয়েও তিরিশোত্তর চেতনা এবং সংসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । তারাশঙ্করের রচনায় বীরভূম এবং রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনচিত্র অত্যন্ত নিঁখুত এবং বাস্তবসম্মত হয়ে ধরা দিয়েছে ।

তাঁর গল্প-উপন্যাসের সংলাপে, আঞ্চলিক শব্দসম্ভারে কাব্যগুণ এবং জীবনদর্শন মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির জগৎ প্রকাশ পায় । অপরপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একদিকে যেমন রচনা করেছেন 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) তেমনি অন্যদিকে লিখেছেন 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' 'হারাণের নাতজামাই'-এর মত গল্প । তাই তাঁর রচনাতেও বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীতে চল্লিশের-দশকের কথাশিল্পীরা ভাষার আধুনিকতা নিয়ে আরও নিত্য নতুন পরীক্ষায় মনোযোগী হয়েছেন। মূলত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের ভাববিলাসময় জীবনাচরণ এ পর্বে সাহিত্যামোদীদের মূল আকর্ষণীয় বিষয় । এদের জীবন বিন্যাস,আপাত মার্জিত অথচ হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সঙ্কট, নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা-প্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্যের সযত্ন প্রকাশ করেছেন এ পর্বের কথাশিল্পীরা । সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৭০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৭০) , বিমল কর -এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী ।

তবে চল্লিশ-উত্তর প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বের বাঙালি মুসলিম ঐতিহ্য লালিত আর একটি ধারা এ সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল পূর্ববঙ্গে তথা বর্তমান বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব

পাকিস্তানে। মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক,কাজী আব্দুল ওদুদ, মাহবুব-উল-আলম, আবুল ফজল, হুমায়ূন কবির -এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম ।

এভাবে সাতচল্লিশ পরবর্তী সময় থেকে বাংলা সাহিত্য সমান্তরালভাবে দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে । যার এক একটি ধারা চলতে থাকে বর্তমান বাংলাদেশে অপরটি বাংলা সাহিত্যের পীঠস্থান কলকাতাকে কেন্দ্র করে । এই ধারার একদিকে রয়েছেন-সত্যেন সেন, আবু-জাফর শামসুদ্দীন, আশরাফুজ্জামান, শওকত ওসমান, আবু রূশদ, রাশীদ কাজী, কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সরদার জয়েন উদ্দীন ,শহীদুল্লা কায়শার, রশীদ করিম, আবু ইসহাক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আলাউদ্দীন আল আজাদ, জহির রায়হান, আবুবকর সিদ্দিক, আব্দুল গফফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রাবেয়া খাতুন, শওকত আলী, রিজিয়া রহমান, আহমেদ ছফা, আখতারাজ্জুমান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন, হুমায়ূন আহমেদ, মহম্মদ জাফর ইকবাল, ইমদাদুল হক মিলন- প্রমুখ ;আর অপর ধারায়- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু,প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার প্রমুখ ।

এদের সকলেই বিষয় বৈচিত্র্যে যেমন একে অন্যের থেকে পৃথক তেমনি এদের ভাষা ব্যবহারের মধ্যেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য । একদিকে শহীদুল্লা কায়সার তাঁর ‘সংশপ্তক’ (১৯৬৫) উপন্যাসে তুলে ধরছেন বাংলাদেশের সামন্ত আভিজাত্যের অবসান, গ্রামজীবনের সংকীর্ণতা, কুসংস্কার এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ঢাকার চিত্র তো অন্যদিকে রাঢ় ও গাঙ্গেয় বঙ্গে বর্গী আক্রমণের ইতিহাসকে অবলম্বন করে মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন ‘আঁধার মানিক’ (১৯৬৬) । মোটকথা প্রত্যেকেরই অবস্থান একে অন্যের থেকে যোজন যোজন দূরে। আর এই বৈচিত্র্যের মুকুটে আর এক পালক যোগ করলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । তিনি ভাব, ভাষা এবং আঙ্গিক সকল ক্ষেত্রেই নূতনত্ব যোগ করলেন । তবে এ অধ্যায়ে আমার আলোচ্য বিষয় যেহেতু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ভাষাশৈলী তাই এক্ষেত্রে তাঁর ভাষাগত বৈচিত্র্যের দিকেই দৃষ্টি দেব ।

ছোটগল্প, উপন্যাস, কিংবা নাটক - সৃজনশীল গদ্য সাহিত্যের এই সবকটি শাখার মধ্যেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রকরণরীতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্মে ভাষার বৈচিত্র্য, শব্দ কৌশল, এবং চেতনাপ্রবাহরীতি-- এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই অনন্য হয়ে উঠেছে তাঁর আধুনিক ও মননশীল বিষয় বিবেচনার গুনে । গ্রাম, গ্রামীণ সমাজ এবং মানুষ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যের কেন্দ্রিত বিষয় । ফলত তাঁর ভাষাও সেই গ্রামীণ, লোকজ, সাধারণ জীবনেরই অনুগামী শব্দভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববাংলার দৈনন্দিন আবহমন্ডিত প্রচলিত দেশজ শব্দের অগনন ব্যবহারই কেবল নয়, আধুনিক রূপক, প্রতীক এবং মানুষের অবচেতনগামী জটিল মনোলীন শব্দসম্ভারেও সমৃদ্ধ তাঁর সৃষ্ট জগৎ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সেই সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার এবং কথনভঙ্গিকেই তুলে ধরব এ অধ্যায়ে ।

বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার নিরীক্ষায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রচেষ্টা সীমাহীন । বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্প ‘না কান্দে বুবু’ থেকে যদি এই প্রচেষ্টার শুরু ধরা হয় ,তবে পরবর্তীতে গল্পগ্রন্থ ‘নয়নচারা’ (১৯৪৫), ‘লালসালু’ (১৮৪৮), ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪), ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ (১৯৬৫), ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮) -তে প্রকাশিত এই প্রবণতারই চূড়ান্ত সার্থকতা। বিশেষত ‘নয়নচারা’ গল্পগ্রন্থের- ‘জাহাজী’, ‘পরাজয়’, ‘মৃত্যুযাত্রা’, ‘খুনী’, ‘রক্ত’, ‘খন্ড চাঁদের বক্রতায়’ এবং ‘সেই পৃথিবী’ গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘটেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের সৃষ্টিসত্তার সার্থক উন্মোচন । প্রতিটি গল্পই একান্তভাবে গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল অনুভবে ও উপকরণে সমৃদ্ধ । তাদের মুখের ভাষার স্বাভাবিক শব্দ সচেতনতায় স্বচ্ছন্দ এবং সাহিত্যিক পরিশীলতায় ঐশ্বর্যবান ।

‘না কান্দে বুবু’-গল্পটির নামকরণের মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি গল্পটি কোন গ্রামীণ প্রেক্ষাপট অবলম্বনে রচিত । স্বাভাবিক ভাবেই গল্পের আঞ্চলিক রীতির আবহ ফুটিয়ে তোলার জন্য লেখক গ্রাম্য উপভাষা ব্যবহার করেছেন । ‘বাপ’, ‘বুবু’, ‘জোয়ান’, ‘মর্দ’, ‘ঝাপ’ প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের জাদুকরী ছোঁয়ায় আশ্চর্য স্মৃতিবাহী এবং চেতনাবহুল গল্পটির বর্ণনার গতিভঙ্গি । একই সঙ্গে বর্ণনার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখের ভাষার মোহময় ছন্দ--

‘‘আফতাব ভাবে, চার বছর পর । চার বছর পরে বাড়ি যাচ্ছে । কলাপাতা-ঘেরা আম-জাম-গাছের ধারে, খাল-বিল- নালা-ডোবার পাশে শতসহস্র ঘনবসতির মধ্যে বসবাস-করা

লোকদের জন্য চার বছর পরে বাড়ি যাওয়াটা বড় কথা। সে-কথা পুঁথির মতো আসাধারণ, নাড়ি ছেঁড়ার মত গায়র-মামুলি ।

-আফতাব মিঞা দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না । আফতাব মিঞা চাইর বচ্ছর দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না । শহরে থাকে । হেই বড় শহরে । আফতাব মিঞা গাড়ি-ঘোড়ায় চলে। ।.....

-শহরে থাইকা আফতাব মিঞা বাড়িৎ কেবল টেকা পাঠায় । বাড়িৎ আছে নুনা মিঞা, তার বুড়া বাপ । বুড়া জমিজমা দ্যাখে আর বাতের ব্যথায় কঁকায় ।''[৯]

আবার এই বর্ণনার মাঝে মাঝে বাংলার পুঁথির কাহিনির সরাসরি ব্যবহার গল্পের ভাষাকে আরও বৈচিত্র্য মন্ডিত করে তুলেছে । যেমন--

'' -ভাই সকল কাতারে দাঁড়াইয়া যান । ভাই সকল, লাইন বাঁধেন, খোদার সামনে কাতার হইয়া দাঁড়াইয়া যান । আসুক হাতি, আসুক বাঘ, আসুক শয়তান । শোনভাই বন্ধুভাই মন দিয়ে শোন, হেনতেন মুখে রা করিবে না কোনো । আর গুরুজনে মানিবে সদা, সম্মুখে না কহিবে কথা । দেখিলাম কী দেখিলাম, শুনিলাম কী শুনিলাম । দেখিলাম শুনিলাম আর পাইলাম খাইলাম । মানিলাম কীর্তি-কুদরত তোমার, লহ লক্ষ কোটি সালাম শোকর । আর গুরুজনে মানিবে সদা, তাতে যেন না হয় অন্যথা ।''[১০]

'মৃত্যু-যাত্রা' 'জাহাজী', 'পরাজয়', 'খুনী', 'রক্ত' প্রভৃতি গল্পগুলোতে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক উপভাষা অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । গল্পগুলোর ক্ষেত্রে যে সব অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল-- রংপুর (মৃত্যু-যাত্রা), চট্টগ্রাম-নোয়াখালি (জাহাজী), নোয়াখালি-রংপুর (পরাজয়), নোয়াখালি-রংপুর (খুনী)। 'মৃত্যু-যাত্রা'- গল্পের চরিত্রসমূহের ভাষায় ব্যবহৃত পদের শেষধ্বনি ক-এর স্থলে গ উচ্চারণ, এ-এর স্থলে ই, শব্দের আদিতে ল-এর স্থলে ন ব্যবহার -প্রভৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি এ উপভাষা রংপুর ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলের । এ প্রসঙ্গে তিনুর ভাষা স্মরণীয়--

''-কুতি যাবা আজ ? সন্দি নাগে-নাগে, গঞ্জে পৌঁছুতি অনেক রাত হয়ি যাবে । তার চাইতি চল মোরা গাঁয়ে যাই । এক চৌধুরী সায়েবের কথা শোনলাম, পায়ে ধরি পড়লি পরে দুটি খাতি দেবেন না কি ?''[১১]

দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু আর আত্মানুসন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রচিত গল্প 'মৃত্যু-যাত্রা'। বেঁচে থাকার প্রচন্ড তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরাভিমুখে চলেছে খেটে খাওয়া মানুষের একটি দল । সেই দলের মানুষগুলোরই বিচিত্র অনুভূতি এবং উপলব্ধির আবেগরহিত নিঁখুত বিবরণে সমৃদ্ধ এ গল্পের আখ্যানভাগ । যে জীবনের অনন্ত তাগিদে তাদের এই সকল পদযাত্রা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তার নামকরণ করেছেন 'মৃত্যু-যাত্রা' । গল্পটিতে নিষ্ঠুর বাস্তবতা দানা বেঁধেছে বুড়ি হাজুর মার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে । দলের মানুষগুলোর বিচিত্র অনুভূতির সার্থক ভাষারূপ দিয়েছেন গল্পের এ পর্যায়ে এসে । চরিত্রগুলো কথা বলেছে তাদের একান্ত নিজস্ব ভাষায় । এক্ষেত্রে নিরন্ন সাধারণ মানুষগুলোর সহজাত অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে অধিকতর বাস্তব সত্যের আলোকে--

''-কই গো বাপু, নাহ । বুড়িটা তো জ্বালায়ে-জ্বালায়ে অবশিষি মরে বাঁচালে মোদিগ,কিন্তুক বুড়োটা হাড়ে-মাসে জ্বালাবি-

করিম একটু ঝুঁকল । কী হয়েছে ?

বুড়োর ধড়ে প্রাণ নেই ।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা । তারপর সবাই অসহ্য বিরক্তিতে একসাথে কথা কয়ে উঠল; এত অপেক্ষার পর সদ্যমুক্তিলাভেই আবার নতুন বাধার সৃষ্টিতে ওরা আবার যেন ক্ষেপে উঠেছে ।

-থাক পড়ি বুড়োর লাশ- রেগে তোতা বললে । কিন্তু হালুর মা বললে,

-আহা, মোরা তো গাঁয়েই যাচ্ছি-ওই যে কারা সেবা করতি এসেছিল, তাদিগ খবর দেয়া যাবিনি খন ।

এ-প্রস্তাবে কেউ কোনো আপত্তি তুলল না । এবং কলরব চরমে তুলে ওরা চলল গাঁয়ের পানে।''[১২]

বস্তুত, 'মৃত্যু-যাত্রা'-য় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি বিশেষ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-দীর্ণ নিরুপায় মানুষের প্রতিকারহীন যন্ত্রণাকে রূপ দিতে চেয়েছেন । ফলে এ গল্পে যেমন কোনো একক চরিত্র প্রাধান্য পায়নি, তেমনি এর ভাষাশৈলীও হয়েছে আঞ্চলিক উপাদানে প্রাত্যহিক ও বিশিষ্ট। কেবল 'মৃত্যু-যাত্রা'-ই নয় , আঞ্চলিক সংলাপের বহুমাত্রিকতায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'জাহাজী' গল্পটিও । বস্তুত সংলাপ বিরলতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্প-উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও 'জাহাজী' গল্পে চরিত্রদের মুখে

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-নোয়াখালি অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যা জাহাজী মানুষদের প্রচলিত মুখের ভাষা --

''-ছাত্তারগারে ফাডাই দিয়ো তো-

.....

একটু পরে সে শুধু প্রশ্ন করল ঃ

-বারিৎ কন আছে তোর ?

ছাত্তারের মা আছে, বাপ আছে, তাছাড়া তিনটি বোন দুটি ভাই-ও আছে ।

.....

-বাড়ির লাই মন কাঁদে ।

স্বাভাবিক । সারেঙ্গ কোনো কথা বললে না ।

একটু নীরব থেকে ছাত্তার আবার বললে ঃ

-আর, বারির তুন পলাই আস্যি আঁই-ইয়ল্লাই মন আরো ব্যাশ কাঁদে জে ।''[১৩]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'পরাজয়' ও 'খুনী' গল্পদ্বয় পূর্ববাংলার নদী তীরের জেগে ওঠা, চরতাড়িত ও চরপীড়িত জীবনেরই নির্মম ভাষ্য, নিরাবেগ কাহিনি । আঞ্চলিক মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা রূপায়ণের এ প্রয়াস তিন দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্যণীয় প্রবণতা । শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এক্ষেত্রে সর্বাধিক । তাঁর 'কয়লাকুঠি' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, ওয়ালীউল্লাহ্‌র আত্মপ্রকাশের পূর্বে । কিন্তু আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাব শৈলজানন্দের গল্পের পটভূমিই কেবল বাংলা কিংবা বিহারের খনি অঞ্চল, গল্পের মৌল সংকট একান্তই ব্যক্তিগত, কখনও একটি আবার কখনো একাধিক চরিত্র-কেন্দ্রিক । আর এই বিশেষ মনোভঙ্গির কারণেই তাঁর 'কয়লাকুঠি' একটি খনি অঞ্চলের শিল্পালেখ্য হওয়ার পরিবর্তে হয়ে উঠেছে নানকু-বিলাসীর দাম্পত্য জীবনের ভাষ্য বা পীরু-ভুলি-টুরনীদের মত কারও ত্রিভুজ প্রেমের উপাখ্যান । এখানেই ব্যতিক্রম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ । তিনি বুঝেছিলেন যে, ঐতিহ্যানুরক্তিতে মুক্তি খুঁজলে চিত্রল পতঙ্গের মতই আহূতি দিতে হবে। তাই উত্তরাধিকারে সমর্পিত ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই তিনি আত্মমুক্তি অন্বেষণ করেছেন । ফলে তাঁর চরাঞ্চল আশ্রিত গল্পগুলিতে সেই বিশেষ অঞ্চল, নির্দিষ্ট এলাকা নির্বিশেষে মানুষের জীবনসংগ্রামই মুখ্য, ব্যক্তি সেখানে সমষ্টিরই প্রতিনিধি, প্রতীক ও প্রতিভূ ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর 'খুনী' গল্পে চরিত্রের প্রয়োজনেই নোয়াখালী ও রংপুরের উপভাষা ব্যবহার করেছেন । চর আলেকজান্দ্রার সোনাভাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা রাজ্জাক উত্তরবঙ্গের কোন এক শহরে পালিয়ে আবেদ দর্জির কাছে যখন নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে--

''-আঁর নাম রাজ্জাক । আঁই আলেকজান্ডার চরের সোনাভাঙ্গা গেরামের মৌলবীর বাড়ির ফোলা । চৈত্ মাসে একদিন দুফুর ওক্তে ফজুমিঞা'গর বাড়ির ফইন্যার মাথা ফাডাইলাম, ফাডাই জানের ডরে দেশ ছাড়ি ফলাইলাম । তারপর তুন - এই বলে হঠাৎ সে কী একটা নিদারুণ ভয়ে থেমে গেল, তার চোখ দুর্জয় ভয় ও শংকায় কেমন হয়ে উঠল;''[১৪]

বস্তুত রাজ্জাকের এই কণ্ঠনিঃসৃত সংলাপ, তার মধ্যবর্তী ম-ধ্বনির অনুনাসিক উচ্চারণ, শব্দের আদি ধ্বনি প-এর স্থলে ফ ইত্যাদির ব্যবহার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সে নোয়াখালির সেই বিশেষ চরাঞ্চলের বাসিন্দা, যেখানে জীবনের জটিলতা, বৈরী প্রকৃতির কারণেই মানুষ হয় রুক্ষ, অল্পতেই উত্তেজিত। অপরপক্ষে উত্তরবঙ্গের 'কোন এক মহকুমা শহর'-এর অধিবাসী আবেদ দর্জির ভাষা থেকেও জানা যায় তার বাসস্থান ঠিক কোথায়-- 'কেডা বাহে', 'কেডা তুমি', 'মোর ছেইলা' -ইত্যাদি বাক্য থেকে জানা যায় অঞ্চলটি রংপুর বা তার পার্শ্ববর্তী কোন জনপদ । গল্পটিতে ওয়ালীউল্লাহ্ আঞ্চলিক উপভাষাকে একজন ন্যাচারালিস্ট চিত্রশিল্পী যেমন নিসর্গচিত্রে রং ব্যবহার করেন সেভাবেই ব্যবহার করেছেন । ফলে তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীর মুখ-নিসৃত আঞ্চলিক বুলি-ই তাদের জীবন-জিজ্ঞাসা, শ্রেণি-অবস্থান, স্থানিক পরিচয়কেই করেছে সমুন্নত, উচ্চকিত ও বাস্তবানুগ ।

আমরা দেখেছি, শিল্পী হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে বহির্জগতের তুলনায় অন্তর্জগতই বরাবর অধিক প্রাধান্য পেয়েছে । তাঁর চরিত্ররা অন্তর্মুখী, সংবেদনশীল। ফলে বাইরের ঘটনাবহুল তীব্র আলোক উজ্জ্বল পৃথিবীর উপস্থিতি তাঁর গল্পে নেই । বহির্জগৎকে বিচ্ছিন্ন করে একটি অন্তর বাস্তবতা নির্মাণেই তিনি থেকেছেন সচেষ্ট ও সন্নিষ্ট; আর এই স্বতন্ত্র প্রবণতার কারণে তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভাষায় এক বিশেষ রীতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়, সেটি হল- চেতনাপ্রবাহরীতি ।

বাংলা 'চেতনাপ্রবাহরীতি' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Stream of consciousness'-থেকে । প্রখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ তাঁর 'Principles of Psychology' গ্রন্থে সর্বপ্রথম

এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন । গ্রন্থটিতে তিনি অর্ধচেতন স্তরের নানা ভাবনা -স্মৃতি-অনুভব সহ মানবমনের নিরন্তর প্রবাহকে নদীর প্রবহমান জলধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন--

পরবর্তীতে ১৮৯০-এ প্রকাশিত এই ভাবনারই সমান্তরালে দেখা গেল আর এক দর্শন-দার্শনিক বের্গসঁর 'এলেন ভাইটাল'। বের্গসঁও সময়কে দেখেছিলেন এক ধারাবাহিক প্রবাহরূপে। উভয় দার্শনিকই মানবমনের অন্তর্নিহিত চেতনার রহস্যটিকে ধরতে চেয়েছেন, যা চেতনাপ্রবাহরীতির মূল বৈশিষ্ট্য । পূর্বেই বলেছি চেতনাপ্রবাহরীতিতে ব্যক্তির বহির্জগত নয়, অন্তর্জগতের জটিল টানা-পোড়েন-ই অধিক গুরুত্ব পায় । এছাড়া সময়ানুক্রমিকভাবে একটি সুষম কাহিনিবিন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্লীন আবেগ-অনুভূতি এখানে ব্যক্ত হয় না, এই পদ্ধতিতে চিন্তাভাবনাগুলো আসে এলোমেলোভাবে । যুক্তি-পরম্পরা, বাস্তবতার স্তরভেদ, শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য গঠনের ব্যাকরণরীতি- এসব ভেঙ্গেচুরে ঔপন্যাসিক মানসপ্রবাহের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার ছবিটি ভ্যানগগের চিত্রকলার মতোই পরিস্ফুট করেন। এক্ষেত্রে মানবমনের বহুবিচিত্র ও অসংখ্য চিন্তা ও অনুভবকে, চরিত্রের যে অন্তর্লোক লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাকে গোচরীভূত করতে লেখক গ্রহণ করেন 'অন্তরস্থ স্বগতোক্তি' বা 'Interior monologue' -এর কৌশল । বাংলা সাহিত্যে এই চেতনাপ্রবাহরীতির প্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) এবং 'মোহনা' (১৯৪৩)'-য় । এছাড়া রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'লালমেঘ', গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস-- 'একদা' (১৯৩৯), 'অন্যদিন' (১৯৫০), 'আর একদিন' (১৯৫১), সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫) প্রভৃতি উপন্যাস । বস্তুত বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির যে সার্থক সূত্রপাত ঘটেছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে সেই ধারারই যোগ্য উত্তরসূরি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । কেননা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাসেই- 'লালসালু' (১৯৪৮), 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) ব্যক্তির অন্তর্লোকের সামগ্রিক এবং সার্থক প্রকাশ ঘটেছে । বিশেষ করে শেষ দুটি উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা'(১৯৬৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'(১৯৬৮) -তে চরিত্রের চেতন এবং অবচেতনের অতল গভীরে আলোক নিক্ষেপণে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক । এছাড়াও রয়েছে নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬২) । এ নাটকে চরিত্রদের মনের গতিবিধি এক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক ।

বস্তুত ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ চেতনাপ্রবাহরীতির বিচারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস । উপন্যাসটিতে একই সঙ্গে বয়ে চলেছে দুটি ঘটনার স্রোতধারা । এক, মুহাম্মদ মুস্তফার অন্তর্মুখী চেতনা দুই, কুমুরডাঙ্গার জীবনপ্রবাহ । জাহাজের ডেকে এক নিভৃত বিচ্ছিন্ন জনপদ কুমুরডাঙ্গার বিপর্যস্ত, অনিশ্চিত ভীতি জর্জরিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুঃসহ জীবন যন্ত্রণার যে উপ্যাখ্যান বর্ণিত হয়েছে তবারক ভুইঞার জবানীতে-- সেই বর্ণনার রেশ ধরেই উত্তম পুরুষে উপস্থাপিত উপন্যাসের মূল প্রসঙ্গ মুহম্মদ মুস্তফার সমগ্র জীবন এবং তার চেতন এবং অর্ধচেতন পরিমন্ডল । এই যে একটি চরিত্রের মনোজগতে প্রবেশ করা এবং সেই চরিত্রের বিভিন্ন আচার আচরণ এবং অনুভূতি, অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটানো, এমন জটিল একটি প্রক্রিয়া চেতনাপ্রবাহরীতিরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ভার্জিনিয়া উলফের- ‘Mrs Dalloway' কিংবা জয়েসের- Finnegans Wake, - এ প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখিত নাম । উলফের- ‘Mrs Dalloway' -তে এভাবে একটি চরিত্রের অপর একটি চরিত্রের মনোজগতে প্রবেশ এবং তার চেতনার বহুত্বকে প্রকাশের এ ধরনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । জয়েসের Finnegans Wake, ও একইভাবে জটিল আঙ্গিকরীতির একটি রচনা । উল্লিখিত দুটি রচনাতেই ব্যক্তিলোকের চেতন এবং অবচেতনের ভাবানুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে ‘সময়’ এবং ‘স্মৃতি’র এক বিচিত্র অনুভবের মধ্যে দিয়ে । এক্ষেত্রে স্বপ্ন কিংবা কল্পময়তারও বিস্তৃত অবকাশ রয়েছে । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসেও চেতনাপ্রবাহরীতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেয়েছেন ‘সময়’ এবং ‘স্মৃতি’র নিরঙ্কুশ বিন্যাসে । কল্পনা, স্বপ্নাচ্ছন্নতার ব্যবহার এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় মুহাম্মদ মুস্তফার ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণের একমাত্র উপায় হিসেবে ।

‘সময়’ চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাসের এক বিশিষ্ট অবলম্বন । এ জাতীয় উপন্যাসে বাস্তব সময়ের নিয়মিত এবং নির্ধারিত অবকাঠামোকে ভেঙ্গে-চুরে এক অনির্ধারিত বিভঙ্গ মনস্তাত্তিক সময়ের অবতারণা করা হয় । যেখানে ক্রমানুসার স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলে না, সময়ের গতি এক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির স্মৃতিময় অতীত উপলব্ধির জগৎ থেকে । ফলে অতীত ও বর্তমানের এক ধরনের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ এ জাতীয় উপন্যাসের মূল আঙ্গিকরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে । ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসেও সময়ের বিভ্রমে অতীত এবং বর্তমান এক সঙ্গে মিশে গেছে কথক ‘আমি’ এবং তবারক ভুইঞার স্মৃতিসঞ্চাচারী বিবরণে আর কাহিনির চরিত্ররা যেন একটি ঘূর্ণায়মান নাগরদোলায় বসে আছে যা কখনও থামার নয় । এখানে অতীতময়তার বিষয়টি এসেছে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে--

''মনের অধীরতা চেপে আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, কারণ জলাপাড়া নামক একটি ঘাটে স্টিমার থামলে লোকটি যাত্রীদের ওঠা-নাবায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । তবে তেমন ওঠা-নাবা যে হয় তা নয়; ঘাটটি ছোটখাটো ধরনের হবে । সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে কয়েকজন যাত্রী অদৃশ্য হয়ে যায়, সে- অন্ধকার থেকে আবার কয়েকজন নূতন যাত্রী স্বল্পালোকিত স্টিমারের পাটাতনে মূর্তিমান হয় ।''

স্টিমারটি পুনরায় মাঝ-নদীতে এসে পথ ধরেছে এমন সময়ে কুমুরডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র একটি শহরের কথা বলতে শুরু করে; জলাপাড়া ঘাটের আগে স্টিমার যখন নদীর অগভীর স্থানটি সন্তর্পনে পার হয়ে আবার পূর্ণবেগে চলতে শুরু করেছে তখন সে-শহরের নামই লোকটির মুখে শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিলাম; সে-শহরে মুহাম্মদ মুস্তফা ছোট হাকিমের পদে নিযুক্ত হয়েছিল । লোকটি বলে; অনেক মহকুমা শহর ক্ষুদ্র হয় কিন্তু কোনটাই হয়ত কুমুরডাঙ্গার মত ভাগ্যহীন নয় । জলাপাড়া ঘাটের আগে নদী যেমন অগভীর হয়ে উঠেছে তেমনি সে- শহরের পাশে দিয়ে প্রবাহিত বাকাল নদীটি একদিন অগভীর হয়ে ওঠে শহরবাসীর অজান্তেই এবং তারপর স্টিমার চলাচলের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে । কুমুরডাঙ্গা শহর এমনই এক অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে রেলগাড়ির মত লৌহদানব তো দূরের কথা, তেমন একটি সড়কও কল্পনাতীত যে-সড়ক বর্ষাকালে তলিয়ে যাবে না, বৃষ্টিতে ভেসে যাবে না । নদী-খাল-বিল- এবং বিস্তীর্ণ জলাভূমি পরিবেষ্টিত শহরটির জন্যে দ্রুত যানবাহন হিসেবে যে-স্টিমার ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না সে - স্টিমারও বন্ধ হয়ে যায় । শহরের আর্থিক অবস্থা এমনিতে ভালো ছিল না । তার সমৃদ্ধি শুধু যে স্তব্ধ হয়েছিলো তা নয়, দিন দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছিল । অনেকদিন ধরে ব্যবসা-বানিজ্যে ঘুণ ধরেছিল, উকিল-মোক্তার, হেকিম-ডাক্তারের তেমন পসার ছিল না; কাছারি - আদালত, ছোট একটি হাসপাতাল, হাই-স্কুল, এমনকি মেয়েদের জন্যে একটি মাইনর স্কুল নিয়ে গর্ব করতে পারলেও যে- রহস্যময় কল্যাণস্পর্শে একটি জায়গা জীবিত থাকে, তার উন্নতি হয়, সে- কল্যাণস্পর্শ থেকে শহরটি সদা বঞ্চিত । তার উপর স্টিমারঘাটও বন্ধ হলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ে আর কি ।''[১৫]

আবার তবারক ভুইঞার এ স্মৃতিচারণা কুমুরডাঙ্গার উপখ্যান বর্ণনার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে । তার এ স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে বাকাল নদীর প্রসঙ্গ । মৃত এই নদীর

কারণে শোকাচ্ছন্ন, বিচ্ছিন্ন, দুর্ভাবনা ও অনিশ্চয়তাবোধে বিপন্ন ক্ষুদ্র এক জনপদের সাধারণ কিছু মানুষ । তাদের এই হতাশা ও দুর্দশার কাহিনি শেষ পর্যন্ত একাকার হয়ে গেছে মুহাম্মদ মুস্তফার বিপর্যস্ত জীবন ও তার পরিণতির সঙ্গে । এই তবারক ভুইঞারই বর্ণিত কুমুরডাঙ্গার কাহিনি কথক 'আমি'-র চেতনায় আকস্মিক স্মৃতির প্রতিক্রিয়ায় জাগরূক করেছে মুহাম্মদ মুস্তফার আবাল্য জীবন অধ্যায়-তার শিশুকাল, তার বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন, চাকরিজীবন এবং খোদেজা অধ্যায়--

''মুহাম্মদ মুস্তফা স্টিমার ধরতে আসেনি; যে - শুভকাজটি খোদেজার আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে স্থগিদ রাখতে বাধ্য হয়েছিল সে- শুভকাজটি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই স্টিমার ধরতে এসেছিল। সব বৃত্তান্ত না জানলেও সে- কথা তবারক ভুইঞা জানত। .....। সে জন্যেই কি সেদিন সন্ধ্যা বেলায় নৌকায় করে যাবার উপদেশ দেয় নি তাকে? ততক্ষণে মুহাম্মদ মুস্তফার খেয়াল হয়েছিল, হয়তো দু - একদিনের মধ্যে স্টিমার ফিরে আসবে । তবারক ভুইঞাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, স্টিমারঘাটে নূতন কোনো খবর এসেছে কিনা । তবারক ভুইঞা বলেছিলো, না, কোনো খবর নেই, তবে দু - একদিনের মধ্যে স্টিমার আসবে কিনা সন্দেহ । তখনই নৌকার কথা তুলেছিল । নৌকায় করে যেতে কষ্ট হবে, সময়ও নেবে । পথটা উজানের । স্টিমারে যে - পথ বারো ঘন্টার মাত্র, নৌকায় সে - পথ অতিক্রম করতে দু-দিন লাগবে । তবু বিলম্ব না করে সে যদি রওনা হয়ে পড়ে তবে সময়মত ঢাকায় পৌঁছুতে পারবে ।

''কাল সকালের জন্যে একটি নৌকা ঠিক করে দেন'', মুহাম্মদ মুস্তফা বলেছিল। তবে নৌকায় করেও তার যাওয়া হয় নি, সেদিন রাতে তার ভয়ানক জ্বর ওঠে । এবং দুদিন পরে তবারক ভুইঞা খোদেজার মৃত্যুর কথা জানতে পায় ।''[১৬]

বস্তুত খোদেজার আত্মহত্যা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে এক বিভ্রান্তিকর অলীক বিশ্বাসের জন্ম দেয়, যে বিশ্বাস থেকে সে নিজেই নিজেকে খোদেজার মৃত্যুর জন্য দায়ী ভাবতে শুরু করে । মুহাম্মদ মুস্তফার অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব তার চেতনাকে তাড়িত করে এক ধরনের অন্ধ ভ্রান্তি আর ভীতির দিকে, যেখানে তার নিজের উপলব্ধিও এক সময় হয়ে ওঠে অস্পষ্ট, মিথ্যে কল্পনাপ্রবণ আর যুক্তিহীন । একাকীত্ব আর চেতনার আপাত নৈঃসঙ্গতার নিষ্ঠুর নির্দয় এক পরিস্থিতির চাপে খোদেজার আত্মহত্যার সকল দায় সে নিজের উপর নিয়ে নেয় । সে নিজের

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে তবারক ভুইঞার বিশ্বাসকে গুলিয়ে ফেলে । তার মনে হয় খোদেজার আত্মহত্যার দৃশ্যটি সে নিজে নয় তবারক ভুইঞা দেখছে -

''তখন রাত বেশ হয়েছে । নিত্যকার মতো শুতে যাওয়ার আগে তবারক ভুইঞা নদীর ধারে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল, এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফাকে দেখতে পেয়ে দু-দন্ড আলাপ করবার জন্যে বারান্দার প্রান্তে এসে বসেছে, সিঁড়ির ধাপে পা। ..... একটু পরে মুহাম্মদ মুস্তফা অন্ধকারের মধ্যে আবার তবারক ভুইঞার দিকে তাকায় । লোকটি তখন দূরে কোথাও দৃষ্টি নিবন্ধ করে নিথর হয়ে বসে । তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটি বিচিত্র কথা দেখা দেয় । তার মনে হয়, সে জানে তবারক ভুইঞার দৃষ্টি কোথায়, জানে সে - দৃষ্টি কী দেখছে তাকিয়ে - তাকিয়ে । তার দৃষ্টি একটি পুকুরের ওপর নিবন্ধ । পুকুরটি শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ ডোবার মতো, যে - পুকুরে একটি মেয়ে ধীরে - ধীরে নাবছে । পাড় থেকে ধাপ-কাটা একটি নারকেলগাছের গুঁড়ির যে- সিঁড়ি পানির দিকে চলে গিয়েছে, সেটা বেয়ে নাবছে । এক ধাপ, দুই ধাপ-পাশাপাশি করে রাখা দুটি পায়ে সন্তর্পণে কিন্তু অনায়াসে সে নেবে যাচ্ছে অনেকদিনের অভ্যাসের ফলে । এবার তৃতীয় ধাপ । সে-ধাপের পরে কালো পানি, নিস্তরঙ্গ বদ্ধ পানি । মেয়েটি নেবেই চলে । প্রথমে হাঁটুপানি-তারপর কোমরপানি, অবশেষে বুক পর্যন্ত ওঠে সে-পানি । এবার মেয়েটি আর না নড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, দৃষ্টি কালো পানির দিকে । যেন তার মধ্যে দ্বিধা-সংশয় দেখা দিয়েছে, যেন এবার কি করবে তা সে ঠিক বুঝতে পারছে না, তার গাঢ় শ্যামল ক্ষুদ্র মুখায়বে নিথর ভাব । তারপর হঠাৎ সে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন পেছন থেকে কেউ তাকে ধাক্কা দিয়েছে, মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ নিঃসৃত হয় । শীঘ্র তার মাথা, মাথার উপরাংশ, তারপর মাথার যে-চুল পানিতে ছড়িয়ে পড়েছিল সে-চুল অদৃশ্য হয়ে যায় । কিন্তু আবার তাকে দেখা যায়, কারণ সে ভেসে ওঠে । হয়তো অল্পক্ষণ সে ভয়ানকভাবে হাত-পা নাড়ে , ভেসে থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু ক্রমশ তার দেহ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, কাঠের মতো, তারপর পাথরের মতো । এবং একবার তার দেহ পাথরে পরিণত হলে চোখের পলকে সে শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায় ।''[১৭]

এভাবে কল্পনায় খোদেজার আত্মহত্যার দৃশ্য দেখার পর সারারাত আত্মনিপীড়ন, জরাচ্ছন্নতা, এবং তন্দ্রার ঘোরে একসময় মুহাম্মদ মুস্তফা নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সেই খোদেজার মৃত্যুর জন্য দায়ী। তার কথার খেলাপের জন্যই খোদেজা পুকুরে ডুবে

আত্মহত্যা করেছে । আর এই আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে নিজেও শেষ পর্যন্ত বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ ।

বস্তুত 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে শুধুমাত্র মুহাম্মদ মুস্তফার অবচেতনের এই অতি প্রাকৃত উপলব্ধি, তার চেতনার অস্বচ্ছতা, ভয়, অন্ধ সংস্কার এবং বিশ্বাস এ সবই কোনো একক ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি । উপন্যাসে মুহাম্মদ মুস্তফার ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি উঠে এসেছে তার সামাজিক জীবন ও তার প্রাকৃতিক প্রতিবেশ-ও । সেখানে যেমন স্থান পেয়েছে তার পিতা - মাতা এবং তার পরিবার, তেমনি উঠে এসেছে কুমুরডাঙ্গা গ্রাম, সে গ্রামের বিচিত্র পেশাজীবি মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র আচার-আচরণ এবং তাদের মনোবৃত্তির নানাবিধ বহিঃপ্রকাশ । যেমন মৃত বাকাল নদীর কান্না সর্বপ্রথম শুনতে পেয়েছিলো সাকিনা নাম্নী যে মেয়েটি, তার মনোগত অনুসরণ এবং হৃদয়বৃত্তির বিস্তৃত পরিশীলনের পাশাপাশি এসেছে তার সামাজিক, শ্রেণিগত কিংবা অর্থনৈতিক দিকগত অবস্থানের প্রসঙ্গটুকুও । এছাড়া যে দীর্ঘ বর্ণনায় সাকিনা খাতুনের স্কুল অভিমুখের পদচারণার চিত্রটুকু তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে একের পর এক মিছিল করে এসেছে কুমুরডাঙ্গার বিভিন্ন মানুষ , তাদের বিভিন্ন পেশা এবং মনোভাব নিয়ে । এ যেন তাদেরই লোভ, বৈরিতা, ক্ষমতা এবং অক্ষমতার এক নির্ভুল প্রতিচ্ছবি ।

এছাড়া এ উপন্যাসে যেমন উঠে এসেছে ব্যক্তি মনের সমস্যা তেমনি উঠে এসেছে সামাজিক সমস্যাও । ওয়ালীউল্লাহ্ চেতনাপ্রবাহ ধারার কোনো রীতিগত বাধ্যবাধকতায় উপন্যাসের বিষয়বস্তু থেকে নিজ দেশ, কাল এবং সমাজকে বিচ্যুত করে কিংবা বিচ্ছিন্ন করে দেখাননি । তিনি নিজ দেশ-কাল এবং সমাজকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই চেতনাপ্রবাহ রীতির মত এক জটিল চিন্তাধর্মী, নিরীক্ষা-প্রধান আধুনিক সাহিত্য পরিমন্ডলে বাংলা উপন্যাসের শিল্প চৈতন্য এবং শিল্প সম্ভাবনাকেই উচ্চে তুলে ধরেছেন । আর এখানেই বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির ক্রমবর্ধমান ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আর সকলের থেকে ব্যতিক্রম ।

উপন্যাসের মতো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র অধিকাংশ ছোটগল্পেও আংশিকভাবে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । তাঁর প্রথম রচনা 'সীমাহীন এক নিমেষে' থেকেই সেই যাত্রার সূচনা হয়েছিল । যদিও এই গল্পটিতে এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক লেখকের কাঁচা হাতের ছাপ পাওয়া যায় । পরবর্তীতে পরিণত বয়সে লেখা 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের 'নয়নচারা', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'খুনী', 'রক্ত', 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প'- গ্রন্থের 'দুইতীর', 'পাগড়ি', নিষ্ফল জীবন

নিষ্ফল যাত্রা', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'স্তন', 'মতিউদ্দিনের প্রেম', অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছের 'মানুষ', 'স্থাবর', 'না কান্দে বুবু' ইত্যাদি গল্পগুলোতে চেতনাপ্রবাহ রীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় । এ থেকে অনুমান করা চলে ভাষার রীতির ক্ষেত্রে চেতনাপ্রবাহ রীতি ওয়ালীউল্লাহ্‌র এক প্রিয় আঙ্গিক। তবে কোন গল্পের ক্ষেত্রেই রীতির দিকে নজর দিতে গিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর লেখার মূল উদ্দেশ্যকে অবহেলা করেন নি । যেমন 'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পটিতে চৈতন্যের প্রসার ঘটেছে একক থেকে ব্যাপক মানুষের অনাহারী, মৃত্যুতাড়িত জীবন শঙ্কায় । একদিকে আসগর, তিনু, মতি, করিম, মতি নাপিতের বউ কলমি, আনু, কালু গোয়ালার বউ, হালুর মা, প্রত্যেকেরই অন্তর-প্রদেশ, তাদের ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং ক্ষুধা সংযত বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন লেখক, অন্যদিকে ক্ষুধার পৃথিবীতে ফেলে আসা গাঁয়ের স্মৃতিদীর্ণ আনুর মনোভঙ্গির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন লেখক--

''দলছাড়া হয়ে একটু দূরে আনুটা হাঁটুতে মুখ গুঁজে নীরবে বসে রয়েছে। তাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, ও কি ঘুমিয়ে না জেগে । সে জেগেই রয়েছে বৈকি, তবে তার সে জাগ্রতচেতনা একটু বিচিত্র ধরনের । মেয়েরা যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে থেকে-থেকে-তা-ও তার কানে যাচ্ছে, অথচ কেমন একটা ধুমোল স্বপ্নে তার মনের ভেতরটা সমাচ্ছন্ন । কখনো হয়তো সে-মনে কথা নেই, শুধু মেঘের মতো কালো-কালো ছায়া ঘুরে-ঘুরে ফিরছে, আবার কখনো শুধুমাত্র একটা ডাক বা কথা বা ছবি ঘনায়মান সে-ছায়া কাটিয়ে জেগে উঠছে বারে-বারে । গত কয়েক মুহূর্ত ধরে একটা অত্যুজ্জ্বল অথচ কোমল দুপুর সমস্ত ছায়া অপসারিত করে ভেসে-ভেসে উঠছে কেবল । সারা আকাশ মেঘশূন্য সূর্যালোকে প্রদীপ্ত, স্বচ্ছ - নির্মল নীলিমায় উজ্জ্বল । আর সে-আকাশ বেয়ে প্রখর রোদ ঝরছে অবিরাম, অথচ কোনো তাপ নেই তাতে। কী একটা যেন ঝিকমিক করছে, কী ওটা ? একটা সজনে গাছ । এবং তার তলে সে-ই শুয়ে রয়েছে দেহ এলিয়ে । ভরা পেট, তাছাড়া মৃদু-মৃদু হাওয়া; ছায়ায় শুয়ে জাবর-কাটতে-থাকা গরুটার চোখে যেমন আরামসিক্ত ঘুম আসছে, তার চোখ ভরে-ও আসছে তেমনি ঘুম । তারপর কে যেন আসছে । হ্যাঁ , লকলকে সাঁকো বেয়ে কে একটি মেয়ে এদিক পানে আসছে- সারা পিঠময় তার ছড়ানো ভেজা চুল ঝিকমিক করছে প্রখর সূর্যালোকে । এবং পেট ভরে প্রচুর - প্রচুর খেয়ে এসেছে কিনা, তাই ঝলমল করছে তার সারা দেহ .....

কিন্তু ওধারে হালুর মা জোরে-জোরে কথা কইতে শুরু করেছে । বলতে-বলতে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল । প্রথমে আনু কিছু বুঝলে না । কাঁদবার কি আছে : সজনে গাছের ছায়া, মৃদু-মৃদু

হাওয়া, আর ওই মেয়েটি-কিন্তু আহা, হালুর মা যে হালুকে হারিয়েছে আজ মোটে চার দিন হল । হঠাৎ কী হল, ভেদবমি হয়ে মারা গেল সে - অমন বড়সড় ছেলে । তা এধারে হালু মারা গেল, ওধারে রব্বি মিঞার বউ ও দুটো ছেলে মারা গেল পরপর, তাছাড়া সারা গাঁয়ে আরো কত লোক-কে রাখে তার হিসাব । আনুর হিসাবের বুদ্ধি নেই । যার পেটে যত ভাত তার পেটে তত হিসাবের বুদ্ধি .....''[১৮]

একই অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'নয়ন-চারা' গল্পটিতেও । আবার 'রক্ত' এবং 'খুনী'-দুটি গল্পেই রয়েছে ব্যক্তি চেতনার স্বরূপ উন্মোচন । 'দুইতীর'-গল্পের তীব্র দাম্পত্য সংকট আফসারুদ্দিনের একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ, তার মনোক্ষরণ এবং আত্মোপলব্ধি গল্পটিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তুলেছে । 'গ্রীষ্মের ছুটি' এবং 'স্তন' দু'টি গল্পেই ঘটনা এবং পরিস্থিতির পারম্পর্যে চরিত্রের মনোগঠন এবং তাদের মনস্তাত্বিক স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা রয়েছে । 'স্তন' গল্পেও এক সন্তানহারা মায়ের অন্তঃক্ষরণ, তার মাতৃআকাঙ্খা এবং অপরের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুগ্ধপানে ব্যর্থতা গল্পটিকে সম্পূর্ণভাবে মনস্তত্ব নির্ভর করে তুলেছে । 'মতিউদ্দিনের প্রেম' গল্পটিও সার্বিক অর্থে মনোজাগতিক রীতিধর্মী ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্মে ভাষার বৈচিত্র ও চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার ছাড়াও শব্দ কৌশল, বাক্য রীতি এবং বাচনভঙ্গি -সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক নিজস্ব ভাষারীতি । স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এসব শব্দ ও বাক্যের সঠিক প্রয়োগ তাঁর লেখাকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছিল । ভাষার নিরীক্ষায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র এ প্রচেষ্টার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রথম গল্প 'সীমাহীন এক নিমেষে'-তেই । এটি তাঁর প্রস্তুতি পর্বের রচনা, নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ও কৌশলও তখনও তাঁর অনেকটাই অজানা কিন্ত তাঁর প্রচেষ্টায় কোন খাদ বা আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না । গল্পটিতে চিন্তার সূত্র ঈষৎ ছিন্ন, প্লটের বন্ধন সামান্য শিথিল হলেও গল্পটির ভাষায় অপরিণতির ছাপ অপেক্ষাকৃত কম । এর সর্বত্র রয়েছে হিরণ্ময় উপমা, বিবিধ উৎপ্রেক্ষা আর শিশু-মনের কল্পনা প্রসূত চিন্তার চিত্রকল্প । 'শিশু'-র উপস্থিতি ও লেখকের দূরাগত ভাবনার দ্বৈরথ সন্নিপাতে পুরো গল্পটি এমন একটি গদ্য-আখ্যান হয়ে উঠেছে কবিতাকে স্পর্শ করাই যার সহজাত ধর্ম । 'সীমাহীন এক নিমেষে'-র ভাষারীতির কিছু উদাহরণ দিলে এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ হবে--

ক. ''বৃহৎ জানলাটা খোলা ।

ঝোড়ো হাওয়া ঝাপটা মারছে আমার সারা দেহে। খোলা জানলা দিয়ে ঢুকছে সে-হাওয়া-উদ্দাম মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে । বন্ধনহীন হাওয়া ছুটছে জোরে কঠিন জোরে কঠিন তীব্র হয়ে-জুঁই ফুলের শুভ্র কোমলতা গুঁড়িয়ে দিয়ে-তুলোর মতো উড়িয়ে নিয়ে ।

লতিয়ে আছি বিছানায়, তার কোমলতার সাথে দেহের উষ্ণ কোমলতা মিশিয়ে । নিজেকে মিশিয়ে ভোরের উন্মত্ত আকুল আহ্বানের মাঝে, যেখানে তার লজ্জানম্র অরুণ পরশ বিলীন হয়ে গিয়েছে ।''

খ. ''ছোট্ট নরম পাখিটির মতোই ঠিক । বয়স হবে তের-চৌদ্দ । দেখতে কিন্তু অনেক ছোট। লাল প্যান্টটার ওপর হলদে শার্টটা তার গায়ের সঙ্গে খাপ খায় বেশ,- যেন দু'রঙা প্রজাপতি। তার কোমল মুখে শ্রান্তির আর ব্যস্ততার ভাব দেখতে বেশ লাগে । ঠিক যেন তিন-চার বছরের ছোট মেয়ের তার পুতুলের বিয়েতে চিন্তাযুক্ত ব্যস্ততার মত।''

গ. ''দূর থেকে ভেসে-আসা অপূর্ব বাঁশির মত লাগল নামটা । চমৎকার! এ- যেন তার দেহের ভাষা!

তারপর পরিচয়, জানাজানি, যেন বসন্তের কানাকানি হয়ে গেল আকাশে-বাতাসে । শিশুর ঠোঁট-কাঁপা বন্ধ হল, স্থির হল তার কণ্ঠ । নিবিড় পরিচয়ের ইঙ্গিত জানিয়ে তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফুটলো অনাবিল হাসি-ঝরনার কলধ্বনির মতো ।

দেহ ক্ষুদ্র, নাম ক্ষুদ্র, আর ক্ষুদ্র তার পরিচয় ।

দূরে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত পল্লিতে তার বিধবা মায়ের ছোট্ট নীড়টি, -উন্মুক্ত সুনীল আকাশের তলায়, স্নিগ্ধ নিবিড় বনানীর ছায়ায় ।''

বস্তুত গল্পটির ভাষাশৈলী নির্মাণে লেখকের সাফল্য সর্বত্র অর্জিত না হলেও স্রষ্টার মৌল মানসপ্রবণতা, তাঁর সমাজমনস্ক সত্তার বহির্প্রকাশ ও চরিত্রের বেদনাময় স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৌলিকত্ব স্পষ্ট সংকেতায়িত হয়েছে ।'সীমাহীন এক নিমেষে'-র মত আরও যে সমস্ত গল্পে চিত্রকল্পের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হল- 'নয়নচারা', 'কেরায়া','চিরন্তন পৃথিবী', 'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে', 'ঝোড়ো সন্ধ্যা', 'প্রাস্থানিক', 'পথ বেঁধে দিল.....', 'মানুষ', 'অনুবৃত্তি', 'সাত বোন পারুল', 'ছায়া', 'দ্বীপ', 'প্রবল হাওয়া ও ঝাউগাছ', 'স্বপ্ন নেবে এসেছিলো', 'ও আর তারা', 'সবুজ মাঠ', 'স্বগত' ও 'মানসিকতা' ইত্যাদি গল্পে ।

এদের মধ্যে 'কেরায়া' গল্পটিতে নানা প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করে ওয়ালীউল্লাহ্ মৃত্যুর যে আবহ সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অনন্য । একটি বাস্তব জীবন, বাস্তব মুহূর্ত এই গল্পে ধরা দিলেও গল্পটি আশ্চর্য রকমভাবে কাব্যিক। এর প্রতিটি শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প এবং বাক্যের গঠন-সবই কবিতার মতোই ছন্দময়। যেমন--

ক. ''নৌকায় যাত্রার শেষে কেউ নেই, তা নয়। সেখানে সংসার আছে, বউ বাচ্চা পুষ্যি আছে, তারা অপেক্ষা করে তাদেরই জন্যে-যারা দূরে-দূরে নৌকা নিয়ে যায় কেরায়ার সন্ধানে । বাড়িতে যারা থাকে তারা অপেক্ষা করে । পাখির ছানার মতো নীড়ের নিরাপত্তায় গভীর বিশ্বাসে তারা অপেক্ষা করে । বড় পাখির ডানা দীর্ঘ, তাদের শক্তিও অশেষ; যাদের ডানা দীর্ঘ হয় নাই বা তাতে শক্তি হয় নাই তারা অপেক্ষা না করে কী করবে ? তারা নীড়ের উষ্ণতায় গা ডুবিয়ে আকাশের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে । বড়রা আসবেই । ঠোঁটে খাবার নিয়ে দিগন্ত হতে উড়ে তারা আসবেই, স্নেহ-মমতায় এবং গর্বে গ্রীবা ফুলিয়ে তারা পৌঁছুবেই ।''

খ. ''মৃত্যু জানে তার পরাজয় নাই। তাই হয়তো কখনো বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে তেমনি সে-ও মানুষের সঙ্গে খেলে ।.....বুড়ো লোকটির সঙ্গে বেড়াল-ইঁদুর খেলায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । তাই মুমূর্ষু লোকটিকে একটু রেহাই দিয়ে সে রাত্রির স্নিগ্ধ-সুন্দর বাতাসে নৌকার গলুইতে গিয়ে বসে ।

ঘ. ''তারা নৌকার নোঙর তুলে নেয় । মরা তেলাপোকার গায়ে অসংখ্য পিঁপড়ের মতো অসংখ্য নৌকা নদীর তীরে আঁকড়ে পড়ে আছে । তাদেরই মধ্যে থেকে একটা নৌকা তীর হতে খসে পড়ে । দিগন্তের ওপার থেকে পয়গম্বরের এবং মানুষের খোদা যদি সে-সময় উঁকি মেরে দেখতেন তখন তাঁরও মনে হত তেলাপোকার মৃতদেহ ছেড়ে একটি পিঁপড়েই বুঝি খসে পড়েছে ।''[২০]

বাক্যগুলোতে উপমা, উৎপ্রেক্ষা আর চিত্রকল্পের অপূর্ব সম্ভার দেখে মনে হয় আমরা যেন কোন ছোটগল্প নয়, গদ্য কবিতা পাঠ করছি । একই সঙ্গে মনে পড়িয়ে দেয় আর এক কবির কথা । যার অপূর্ব ভাষা ভঙ্গিমায় ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালি মুগ্ধ হয়েছে বারে বারেই, তিনি জীবনানন্দ দাশ । তাঁর কবিতায়ও আমরা উপমা, উৎপ্রেক্ষা আর চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করেছি । যেমন--

ক. '' সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,

তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন ।''

খ. *''তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,*
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে,
চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার--' ''

লক্ষ্য করার বিষয়, ব্যক্তি জীবনে নিঃসঙ্গ-এ দুই সাহিত্যিক বন্ধুর ভাষাভঙ্গিমাতেও রয়েছে বহু মিল ।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'চাঁদের অমাবস্যা'-র ভাষা এবং শব্দ ব্যবহারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিশ্লেষণধর্মী এবং চিত্রকল্পময় ভাবনার অনুসরণ করেছেন । যুবক শিক্ষকের স্বগত ভাবনায় এবং তার দ্বিধাগ্রস্ত মনের জটিল অর্ন্তনিহিত বিশ্লেষণে উপমান এখানে উপমেয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে বারংবার । যেমন--

'' না, দাদাসাহেবের কাছে সে কাদেরের কথাটি বলতে আসে নাই ।
হয়তো এখনো সে অন্যপ্রকারে স্বপ্নরাজ্যেই বাস করছে, তার একথা মনে হয় যে, সে যেন নিজেকে ভুলিয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের গুহায় নিয়ে এসেছে । কিন্তু তবু তার মনে হয়, সে যেন ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়েছে, কোথাও আশ্রয় নেবার স্থান নাই বলেই মনে বিচিত্র শান্তিও । বস্তুত, মন যেন শান্ত নদীর মতোই একটি গন্তব্য ঢেউশূণ্য, মসৃণ । নদী তবু প্রবাহিত হয় ।সে যেন নদীর মতই একটি গন্তব্যস্থলের দিকে ভেসে যাচ্ছে । সে-গন্তব্যস্থল সে দেখতে পায় না, সেখানে তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর আছে কিনা তা-ও সে জানে না । তবে নদীর ধারা যেমন থামানো যায় না বা তার দিক্‌পরিবর্তন করা যায় না, তেমনি তার পক্ষে থামা বা দিক্ পরিবর্তন করা সম্ভব নয় ।''[২২]

শুধু শব্দব্যবহারেই নয় বর্ণনাভঙ্গিতেও 'চাঁদের অমাবস্যা'-য় ভিন্ন ধাঁচের রীতি ব্যবহার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । এ সম্পর্কে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন--

''এ বইয়ের ভাষা আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই ফলটারিং করেছি । দ্বিধাগ্রস্থ যুবক শিক্ষকের বিলম্বিত চৈতন্যকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য কিছুটা হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গি তৈরি করতে হয়েছে । আমি অবশ্য আরও জটিল করতে পারতাম, ফকনারের 'দি সাউন্ড অব ফিউরী'-র মতো, কিন্তু ইংরেজি ভাষা, বিশেষ করে গদ্য ভাষা যে সমস্ত শিল্পগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাংলা তো

তা নয়, বাংলা লিখিত গদ্যের চলাচলও দীর্ঘ নয় ।তাই একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়েছে । একবার ভেবেছিলাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যভঙ্গির সঙ্গে আধুনিক গদ্যভঙ্গির মিশ্রণ ঘটিয়ে চরিত্রের দ্বিধা-দন্দ্বকে স্পষ্ট করবো । কিন্তু গল্পের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হবার ভয়ে সেদিকে অগ্রসর হইনি ।''[২৩]

কিন্তু পাঠকের প্রতি ওয়ালীউল্লাহের এই সচেতন বোধ থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসটির ভাষা যে সর্বদা লেখক ও পাঠকের মধ্যে মেলবন্ধন হিসেবে কাজ করতে পেরেছে এমনটা জোর দিয়ে বলা যাবে না, বিশেষ করে সেই পাঠকের কাছে, ইউরোপ-মার্কিন সাহিত্য যাদের অনায়াত্ত ।

অপর দিকে 'লালসালু' উপন্যাসে রয়েছে উপমা বৈচিত্র্য । বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ পরিচিত সমাজ ও লোকজ জীবনযাত্রার নিগূঢ় প্রকাশই 'লালসালু'-র উপমারীতির প্রধান সচেতন বিষয়। এতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপমাকৌশল কিছুটা গতানুগতিক হলেও একথা ঠিক যে, লোকজ জীবন অভিজ্ঞতার প্রকাশে পারিপার্শ্বিক অবস্থান থেকে গৃহীত উপমার ব্যবহার এই উপন্যাসে প্রচুর । তবে উপমান সৃষ্টিতে পরিচিত বস্তুর ভাবসাদৃশ্য সত্ত্বেও 'লালসালু'-র বেশকিছু উপমায় অনুভূতির প্রগাঢ়তা এবং ভাব ও ভাষার সুতীক্ষ্ণ সম্মিলনে আধুনিক রীতিকলার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বর্তমান । যেমন--

ক. ''অজগরের মত দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা নেই । তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝঙ্কারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে-কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ উঠে ছুটে পালায় না । দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায় । পানি খায় ঠিক মানুষের মতই । আর অপেক্ষা করে । ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না ।''

খ. ''রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ । যেন জমি, ফসল ধরেছে । ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে । ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোঁকে । শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ !''

গ. ''জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে । ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে-বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে ।''

ঘ. ''এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোন আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে । তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে মনেও এক উদ্যত সাপ

ফণা তুলে আছে ছোবল মারার জন্য । আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নাববার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল,সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে । সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য । তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ ।''[২৪]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গদ্যে উপমা, চিত্রকল্প, বা আঞ্চলিক শব্দের বহুবিধ ব্যবহার ছাড়াও অপর যে বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা তা হল-আরবি-ফারসি শব্দের বহুবিধ ব্যবহার। আমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের রচনায় 'মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন' শীর্ষক অধ্যায়ে পূর্বেই বলেছি ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর ছোটগল্প বা উপন্যাস উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বিচিত্র জনজীবনকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই জনজীবনকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে গেলে তাদের কথ্য ভাষা এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে । তাই সেই ভাষার সঠিক রূপ বজায় রাখতে গিয়ে তিনি সঙ্গতভাবেই প্রয়োজন অনুসারে বাক্যের মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন । যেমন : 'চাঁদের অমাবস্যা'-উপন্যাসে বর্ণিত দাদাসাহেব আলফাজউদ্দীন ইসলামি শিক্ষায় এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন মানুষ । সুতরাং তার ভাষায় বাক্যের মাঝে যদি আরবি-শব্দের ব্যবহার করা হয় তবে চরিত্রটি আরও অধিক পরিমাণে বাস্তবসম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে । আর একজন দক্ষ সাহিত্যিকের মত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ও তাই করেছেন । যেমন--

''প্রথম সপ্তাহে তিনি নির্দেশ দিলেন, বিসমিল্লাহ না বলে কেউ যেন লোকমা না তোলে। শীঘ্র আরেক হুকুম হল, কারো একটি নামাজ যেন কাজা না হয় । (অবশ্য একেবারে নামাজ না পড়া কল্পনাতীত।) তারপর ঈমানের অর্থ, কোরান-পাঠ ও হাদিস-সুন্নার প্রয়োজনীয়তা, তস্‌বি-পড়ার উপকারিতা, নফল নামাজের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যান দিতে লাগলেন । মাসখানেকের মধ্যে বাড়িময় এমন ঘোরতর পরিবর্তন ঘটলো যে ঝানু মোল্লামৌলোবীদেরও তাক লেগে গেল ।.....

কখনো-সখনো তিনি ছেলেদের বংশের কথাও বলেন । বিনীতিশালীনতায় ঢাকা থাকে বলে সহজে তা পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু দাদাসাহেবের মনে বংশগৌরব কম নয় । আজ সে ধনসম্পদ বা মান-ইজ্জত নাই, কিন্তু এককালে চারধারে তাদের বড় নাম-ডাক ছিল । তখন তাঁরা বিশাল জমিদারির মালিক ছিলেন । তাঁদের ঘোড়াশালে তখন ঘোড়া ছিল, হাতিশালে হাতি । খিল্লাত পরিধান করে রেশমের খরিতায় পত্রাদি বাঁধতেন, খাশমহল আতর-বাইদ্‌মস্কের

সুগন্ধিতে ফুরফুর করত এবং বিশেষ উৎসবের দিনে বাদশাহি কায়দায় পথে-ঘাটে মোহর ছড়াতেন । তখন আবদার-চোবদার রাখতেন গন্ডায় গন্ডায়, সাবর-সেবন্দিও পুষতেন । আজ সেদিন আর নেই । তবে সে সমারোহ জাঁকজমক আজ নাই বলে দাদাসাহেবের মনে কোন সময়ে দুঃখ এলেও বংশগৌরবের মতোই সে দুঃখ তিনি ঢেকে রাখেন,প্রকাশ করেন না । তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস, জাঁকজমক হল বাইরের খোলস, অর্থ থাকলেই সে-খোলস আসে । বংশের আসল দাম ধন-দৌলতের উপর নির্ভর করে না । গরিব হলেও আসল খানদানি বংশের দাম পড়ে না । শুধু সোনারূপা, হাতিঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজের শানশওকাত থাকলেই একটি বংশ খানদানি হয় না । খানদানির মূলভিত্তি হল নেক-চরিত্র, ধর্মের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা, সাধুতা-দয়াশীলতা, বিনয়-নিরভিমান ব্যবহার ইত্যাদি গুণাগুণ । দাদাসাহেবের বিশ্বাস, এসব গুণাগুণ বংশপরম্পরায় তাঁদের মধ্যে প্রবহমাণ আছে । একটি তুলনায় তিনি তাঁর যুক্তির পূর্ণ সমর্থন পান । মুসলমানদের শানশওকাত আজ নাই, কিন্তু তাই তাদের অন্তস্থিত মূল্য কি কিছু কমেছে ? অবশ্য এ-যুক্তি তাঁরই ।''[২৫]

'লালসালু'- উপন্যাসের মজিদও যেহেতু স্বঘোষিত ধর্মগুরু তাই তার সংলাপেও আমরা আরবি-ফারসি শব্দের অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করি । যথা--

ক. ''-আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্ । মোদাচ্ছের পীড়ের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন ।''

খ. ''মজিদ থামে । শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না । দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে আবার শুরু করে ।

-পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরূদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । পঞ্চম হিজরীতে প্রিয় পয়গম্বর বাণি-এল মুস্তালিখ-এর বিরূদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করার সময় তার ছোট বিবি কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন । তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন । একটি নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায় । পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায় । যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব-যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠল । হযরতের এত পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগল । বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর । খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবদ্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ

করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে ? উত্তরে খোদাতা'লা মানব জাতিকে বললেন-- থেমে বিসমিল্লাহ পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত করে শোনায় । তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে, স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে । শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে ।'[২৬]

এভাবেই বাক্যের বিচিত্র বিন্যাসে একনিষ্ঠ থেকেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। কখনও আঞ্চলিকতার বৈভবে, কখনও আবার আরবি-ফারসি শব্দের নানাবিধ সংযুক্তিতে সমৃদ্ধ তাঁর শব্দের দৃঢ়তা ও মৌলিকত্ব । একই সঙ্গে এসেছে প্রতীক, উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার । বস্তুত, নিজ দেশ, কৃষ্টি ও সমাজকেই তাঁর গল্প ও উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য ও ভাষার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করতে বরাবর সচেষ্ট থেকেছেন তিনি ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের রচনা থেকে কিছু স্থানিক শব্দের অর্থ ও টীকা নিচে দেওয়া হল :

ওয়াজ-ধর্মব্যাখ্যা বা ধর্মপ্রচার ।

ওয়ালেদ-পিতা ।

আমপারা-কোরাণ মজিদের ত্রিশতম বা সর্বশেষ খন্ড যার প্রথম শব্দ 'আম্ম' ।

এফতার-মুসলিম ধর্মাবলম্বী লোকেরা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্যে সারা দিন উপোস থেকে সূর্যাস্তের পর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন । যা ইফতার নামে পরিচিত ।

এৎবার-রবিবার ।

কাজা করা - ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথা সময়ে সম্পন্ন না করা ।

কেরায়া-ভাড়ায় পাওয়া যায় এমন । যেমন বাড়ি, গাড়ি বা নৌকা ।

কুদরত-বিশেষ ক্ষমতা বা অলৌকিক শক্তি ।

খিলাল-যে কাঠি দ্বারা দাঁতের ফাক পরিষ্কার করা হয়; দাঁতকাঠি ।

লোকমা - গ্রাস । (খাদ্য গ্রহণের সময় যে মাপে আমরা খাই। যেমন এক গ্রাস বা দুই গ্রাস তেমনি তাকে এক লোকমা বা দুই লোকমাও বলা হয় ।)

খানদানি- অভিজাত, উচ্চবংশীয় বা বংশগৌরববিশিষ্ট ।

খৎনা- লিঙ্গমুখের ত্বকচ্ছেদ ।

গজব- অভিশাপ ।

হাবসী- নিগ্রো ।

হুর- পরী ।

সোহর- স্বামী ।

সেহেরি- রোজা রাখার জন্যে মুসলমানগণ সূর্য ওঠার পূর্বে যে খাদ্য গ্রহণ করে ।

বেচায়েন- অস্বস্তি ।

ওজিফা- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তসবি পড়া বা তদ্রুপ ধর্মকার্য করা ।

পাগাড়- ছোট আকৃতির ডোবা ।

পরহেজগার- যে ধর্মবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকে ।

বতোর- জমিতে ফসল বোনার উপযুক্ত সময় ।

বেএলেম- অশিক্ষিত ।

বেত্তমিজ- বেয়াদব ।

বেহুদাপনা- লাজ-লজ্জাহীন ।

বুবু- দিদি ।

বেওয়া- বিধবা ।

বেশুমার- অগুনতি ।

মাজার- সম্মানীয় ব্যক্তির সমাধিস্থল বা কবর ।

মোদাচ্ছের- অচেনা ।

মাজহাব- ইসলাম ধর্মীয় চর্যাপদ্ধতি ।

মুরুব্বি- গুরুজন ।

নিরাকপড়া- হাওয়া শূন্য স্তব্ধতা ।

জাহেল- অশিক্ষিত ব্যক্তি ।

জঈফ- দুর্বল ।

রিজিক- জীবনোপকরণ, অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি ।

রহমত- করুণা ।

ভাতার খাইকা- যে মহিলাকে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয় ।

সুরা-মন্ত্র ।

শরিয়ত- ইসলামি আইন ।

জারুনি- জারজ ।

তালাব- জলাশয় ।

দস্তরখানা- যে বস্ত্রখন্ড বিছিয়ে তার উপর খাওয়া হয় ।

লেবাস- পোশাক ।

তারাবি নামাজ- রমজান মাসব্যাপী ইশার নামাজ শেষে যে বিশ বা বারো রাকাত বিশেষ সুন্নাত নামাজ সাধারণত জামাতে পড়া হয় এবং যে নামাজের মধ্যে হাফিজ ইমাম সমস্ত কোরাণ শরিফ আবৃত্তি করেন ।

তোয়াক্কল- বিশ্বাস ।

নছিহত- ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও উপদেশ ।

নফরমানি- অবিশ্বাসী ।

নফল নামাজ- অতিরিক্ত নামাজ । যা ফরজ বা ওয়াজিব কিংবা সুন্নতমাত্র নয় ।

নূরানী- স্বর্গীয় আলোকপ্রাপ্ত ।

নসিব- ভাগ্য ।

পাশেমানি- বিস্মরণ ।

অজু-শরীর ও মনের পবিত্রতা বিধানের জন্য প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে গড়গড়া করা, কুলি করা, নাকে জল দেয়া, মুখমন্ডল ধোয়া, দুই হাত কনুইসহ ধোয়া, মাথা মসেহ করা ও দুই পায়ের পাতা গোড়ালি সহ ধোয়া । এই নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে প্রত্যেকবার নামাজের পূর্বে মুসলিম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির হাত-পা ধোয়াকে অজু করা বলা হয় ।

ইমাম-যিনি নামাজের নেতৃত্ব দেন ।যার পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া হয় ।

এবাদত-উপাসনা বা প্রার্থনা ।

এরাদা- ইচ্ছা ।

এলেম- বিদ্বান বা জ্ঞানী ব্যক্তি ।

সহবত- নিয়ম কানুন ।

বিবি- পত্নী ।

মহররম-আরবি চন্দ্রবৎসরের প্রথম মাস ।

মুজরিম- অপরাধী ।

মিসকিন- অতি দরিদ্র ব্যক্তি ।

মুরিদ- মুসলিম শিষ্য ।

মুসুল্লি- নামাজি ।

মৌলনা- ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ।

নিকাহ- বিবাহ ।

মোনাজাত- প্রর্থনা ।

মুয়াজ্জিন- যিনি আজান দেন ।

জিয়ারত- মৃতের কবর বা পুণ্যস্থান দর্শন ও প্রদিক্ষণ ।

জিয়াফত- নিমন্ত্রণ ।

জেনানা- নারী ।

জামাত- জমায়েত ।

জালেম- অত্যাচারী ।

জিকির- উচ্চধ্বনিতে আল্লাহর নাম জপ ।

জানেজা- মৃত ব্যক্তির সদগতির জন্য দাফন বা কবরস্থ করার পূর্বে যে নামাজ পড়া হয় ।

নিরম্বু- জলশূন্য ।

ভুক- ক্ষুধা ।

খেদমতগার- সেবক ।

কল্লা- ঘাড় ।

জোহার-নমস্কার ।

বয়েত- আরবি ফারর্সি বা উর্দু কবিতার শ্লোক ।

শালু- লাল কাপড় বিশেষ ।

ইত্তেফাক- মিল

ফতোয়া- ইসলাম ধর্ম শাস্ত্রসম্মত রায় বা লিখিত ব্যবস্থা ।

ফরজ- ইসলামি ধর্মমতে অবশ্য করনীয় ।

হায়াত- পরমায়ু ।

হাসর- মুসলিম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন ।

হালাল- ইসলাম ধর্ম অনুসারে পবিত্র ।

কায়েম- স্থায়ী ।

কাবিন- মুসলমান বিয়েতে কন্যাকে দেয় মোহরানা ।

কাজি- মুসলমান বিচারপতি ।

ওয়ারিস- উত্তরাধিকারী ।

তথ্যসূত্র :

১. হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল (সম্পাদনা) - ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, স্বরোচিষ সরকার, বাংলা অ্যাকাডেমী, ২০০৭, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

২. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪৮ ।

৩. ঐ, পৃ-৪৮ ।

৪. ঐ, পৃ-৪৮.

৫. ঐ, পৃ-১০৮

৬. বঙ্কিম রচনাবলী, উপন্যাস সমগ্র, তুলি কলম প্রকাশনি, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ-৯

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ - চোখের বালি, বিশ্বভারতী প্রকাশন, পৃ-৩৩

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ - চতুরঙ্গ, বিশ্বভারতী প্রকাশন।

৯. হামিদ, শামীমা - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম, শব্দব্যবহার ও চেতনাপ্রবাহরীতি, বাংলা অ্যাকাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ-৩ ।

১০. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৩০২

১১. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৩০৪।

১২. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ২৭

১৩. ঐ, পৃ-২৮

১৪. ঐ, পৃ-১৩

১৫. ঐ, পৃ-২৯

১৬. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - উপন্যাস সমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ১৫৫ ।

১৭. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ১৬৭।

১৮. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ২৩০

১৯. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ২৪।

২০. ঐ পৃ-১১৯.

২১. ঐ, পৃ-৮১

২২. জীবনান্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি প্রকাশনি, ১৯৫৪, কলকাতা, পৃ-৪৭,৭১।

২৩. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - উপন্যাসসমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ১৪০

২৪. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্য জিজ্ঞাসা, তানভীর মোকাম্মেল, আগামী প্রকাশনী ২০০০, বাংলাদেশ, পৃ-৬০

২৫. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - উপন্যাস সমগ্র, লালসালু, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, উপন্যাস সমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ৭৭

২৭. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - উপন্যাস সমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ৬, ১৭